একটি নীরব বিপ্লব : গান্ধীজীর শিক্ষা চিন্তা

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সি*

শিক্ষা যেহেতু শব্দ, ধারণা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এক অপূর্ব প্রকাশ তাই এর ভিন্ন মাত্রা ও রূপ খুঁজে পাওয়া বাস্তবে সম্ভব। শাশ্বতভাবে শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনায়াসেই বলা যায় সেই পদ্ধতির কথা যা ব্যক্তির শরীর, মন ও আত্মার উদ্বোধনের সহায়ক। কিংবা সেই পদ্ধতি, যার সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে ব্যক্তি-মানস সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সানাজিক শোষণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির আত্মরক্ষার বর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দুয়ের বাস্তবিক প্রকাশ মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিজীবনে পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, মেকলের দৃষ্টিতে শিক্ষা সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়ার 'সংস্থাপক' হলেও তা আবার হতে পারে সমাজ পরিবর্তনের একটি কারক। অথবা, কখনো কখনো শিক্ষা শুধুই 'আভিজাতিক' (Elitist) রূপেই প্রতিভাত হয়। তখন শিক্ষাই হয়ে ওঠে সামাজিক বিচ্ছেদ ও জটিলতা সৃষ্টির এক বড় কারণ। এই রূপটির ভয়াবহতা দেখেই ইভান ইলিচ প্ররোচিত হন 'বিদ্যালয় বিহীন সমাজের' তত্ত্ব অবতারণায় এবং এভারেষ্ট রাইমার এই সামাজিক হিংসার উৎসকে রোধ করতেই গান্ধীর মডেলকে অনিসরণ করে উদ্যত হন 'বিদ্যালয় মৃত' তত্ত্ব ঘোষণায়।

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী প্রিতরম সোরোকিন তাঁর 'মানবতার পুনর্গঠন' (Reconstruction of Humanity) নামক ভাবনাঋদ্ধ গ্রন্থটিতে (উল্লেখ্য, গ্রন্থটি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল) বর্তমান সভ্যতাকে 'অনুভূত সভ্যতা' (Sensate Civilisation) বলে উল্লেখ করে শুধু যে এই সভ্যতার তৃষ্ণাকে অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির সঙ্গেই একীভূত করেছেন তাই নয়, গ্রন্থটিতে দিয়েছেন মানবতার এক নতুন মাত্রা। সোরোকিন লক্ষ্য করেছেন, যুদ্ধ ও আনবিক ধ্বংসের বয়াবহতা দেখেই বর্তমান প্রজন্মের মানুষ প্রাণপণে মৃত্যু ফাঁদ এড়াতে চাইছে। - চাইছে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, ঘৃণার পরিবর্তে প্রেম এবং সমষ্টির বৃহত্তর জ্ঞানের উন্মেষ।

একইভাবে ইটালীতে ১৯৩১-এর শেষ প্রহরে মারিয়া মন্ডেসারী, মহাত্মাকে স্মরণ করে, যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে শান্তির বতাবরণ ফেরানোর ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ পৃথিবীতে কাঙ্খিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বা মানুষের মধ্যে প্রেমকে সদা জগ্রত রাখতে বর্তমানে শিশুদের ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে। মারিয়া সত্যিকারের গণতন্ত্র বা শান্তির নব মাত্রা খুঁজতে শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন।

একথা ঠিক, অন্যান্য তাত্ত্বিকদের সঙ্গে তুলনায় গান্ধীজীর শিক্ষার মডেলে একটি মৌল পার্থক্য রয়েছে। গান্ধীজীর বিশেষত্ব এখানেই যে, শোষণ ও কর্তৃত্ববিহীন অহিংস সত্য সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি জীবজগৎ ও শিক্ষা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বহন করতেন। এরূপ সমাজে 'কর্ষিত' ব্যক্তিমানসকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, যেহেতু গান্ধীজী জীবনের গুণগত উৎকর্ষতা অর্জন ও জীবনকে অর্থবহ করতেই আগ্রহী ছিলেন, সেহেতু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি তার ভাবনা স্বাভাবিক গতিতেই ধাবিত হয়েছে। মহাত্মা কখনোই চাননি কেবল শিক্ষার জোরে পৃথিবীতে উচ্চকোটির মানুষেরা সামাজিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে রাখবে এবং শিক্ষা না থাকার 'দোষে' এক বিরাট সংখ্যক মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে চিরকাল 'বহিরাগত' হয়েই কাটিয়ে দেবে। সুতরাং মহাত্মার বহুধাবিস্তৃত

*** প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ গান্ধীকর্মী ও গবেষক। ডাইরেক্টর-সেক্রেটারী, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর।**
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন, শিক্ষা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, সারেন্ডার নট্ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, পণপ্রথা রোধে মহাত্মা গান্ধী, শতবর্ষের আলোয় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ইত্যাদি। শেষ গ্রন্থ দি মিলেনিয়াম ম্যাম ও অন্যান্য প্রবন্ধ।

ভাবনার মধ্যে শুধুই বাস্তব্যার ছাপ ছিল না। অবশ্যি ছিল এক চির নতুন সৌরভ। তাঁর ভাবনায় এই নতুনত্বের উপস্থিতি চিরায়িত ধারণাগুলিকে নতুন মাত্রা দিতে সচেষ্ট থেকেছে। হাতে-কলমে কাজ করার যথার্থ অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি পেরেছিলেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশতকে উপলব্ধি করতে এবং সেজন্যই আগ্রহী হয়েছিলেন শিক্ষার বিষয়গত ও পদ্ধতিগত দিককে নতুন রূপে সাজিয়ে তুলতে। এর ফলে শিক্ষা শুধু যে সর্বজনগ্রাহ্য বা বোধ্য হবে তাই নয়, সবশ্রেণীর মানুষও একই পদ্ধতির অধীনে আসতে পারবে। পাশাপাশি এর সফল প্রয়োগ দ্বারা অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্যকে দূর করে এক সর্বোদয় সমাজও অর্জন করা যাবে।

এই পদ্ধতিকেই তিনি 'মূল শিক্ষা' বা Basic Education বলে অভিহিত করেছেন যা সমাজে 'কর্ষিত' মানুষকে কাঙ্খিত উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। সমাজে 'কর্ষিত' মানুষের প্রয়োজন চিরকালের। কারণ মহাত্মার দেখা সর্বচ্চো ক্ষমতা কাঠামো অর্জনের পথে কিছু মূল্য বা ত্যাগ স্বীকার করা এই মানুষদের দ্বারাই সম্ভব। গান্ধীজী বলছেন, মূল শিক্ষার সূচনা হবে পিতা-মাতার দ্বারা। কারণ তাঁরাই শিশুর প্রথম শিক্ষক। অপর একটি ক্ষেত্রে তিনি বলছেন, এই শিক্ষা অর্জনের কাল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যপ্ত। কিন্তু 'মহৎ' ও 'সত্যবাদী' জীবন-ধারা অর্জনের প্রেক্ষিতে এর সময়োপযোগী রূপভেদ স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, গান্ধীজী 'সত্য সমাজ' গঠনের কথা বলেছিলেন। সেখানে স্বেচ্ছা-নিবৃত্তির শিক্ষা নেওয়া আবশ্যিক। এই শিক্ষা শুরু হবে শিশু বয়স থেকেই।

গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা তাঁর সঠিক বিপ্লবী ভাবনার অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। শুধু ভাবনাতেই নয়, কাজের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ বিল্পবী। যিনি ধ্বংস ও পুনর্গঠনের কাজ একই সাথে করতে চেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক শোষণ কাঠামোকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার পাশাপাশি তিনি শুরু করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ করেছিলেন সেগুলিতে নেতৃত্ব দেবার জন্য। মহামতী গোখলের অনুসরণেই বলা যায়, মহাত্মা কাদার পিন্ড থেকেই মানুষকে সার্থকভাবে বের করে এনেছিলেন।

গান্ধীজী যখন বিদেশী চাকুরী, আদালত বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সে সময়ই সর্বপ্রথম বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে 'মূল শিক্ষা'-কে রূপ দিতে তৎপর হন। উল্লেখ্য, কিছু পূর্বে, শ্রী অরবিন্দের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ড এরকমই উদ্দেশ্য নিয়ে সূচিত হয়েছিল। যাই হোক, বিকল্প শিক্ষা রীতি প্রচলনের দ্বারা গান্ধীজীর মানসিকতাও প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে অন্তর্ভূক্ত না করায় তিনি এরূপ ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সুতরাং শুধু প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই নয়, সকল গুণ ও মাত্রা সহ 'সত্যিকারের' শিক্ষা দ্বারা প্রচলনের বাসনাই তাঁকে মূল শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায় এ ক্ষেত্রে কিঞ্চিত সাফল্য পেলে, স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেই সাফল্যকে আরো সুদূরপ্রসারী করতে উদ্যোগী হন। স্মরণ করা যেতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকা বা বারত উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অধিনস্থ ছাত্রদের তিনি 'সত্যাগ্রহী' রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রয়োজনে অন্যায় বা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের অন্তর্ভূক্ত করতেও দ্বিধাহীন ছিলেন।

গান্ধীজী এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে শিক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থের আনুকূল্যের অভাবই অনেককে শিক্ষা পেতে বঞ্চিত করে। সে কারণে তিনি শিক্ষাকে 'স্বনির্ভর' করতে আগ্রহী ছিলেন। এর অর্থ এই যে, বিদ্যার্থীরা শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি অর্থ-উপার্জনের পথকেও উন্মুক্ত রাখবে। এর দ্বারা তিনি যে কেবল কারিগরী শিক্ষাকেই ঈঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তা কিন্তু নয়, এর তাৎপর্য আরো গভীর ও ব্যাপক। মূলত,

তৎকালীন দেশীয় পরিস্থিতি এ বিষয়ে তাঁর ধারণাকে সুসংবদ্ধ করেছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে এরূপ শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ স্বীয় ব্যক্তজীবনকেও স্বনির্ভর করতে পারবে।

শিক্ষা সম্পর্ক মহাত্মার দারণার অপর কিছু বিশেষ দিক ছিল। তিনি শিক্ষার ভূমিকাকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার 'সংস্থাপক' রূপে সীমাবদ্ধ না রেখে, একে নতুন সমাজ ব্যবস্থার 'নির্মাতা' রূপে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন প্রচলিত ব্যবস্থায় 'শিক্ষিত সুবিধাপ্রাপ্ত'-দের সঙ্গে 'সুবিধাহীন অশিক্ষিত'-দের সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই শিক্ষাকে চাকুরী প্রাপ্তির যোগ্যতা রূপে তুলে না ধরে তিনি একে অন্ত্যজ মানুষের উন্নতি ও ক্ষমতা আহরণের পথের দিশা রূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। এই ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারলেই সংঘর্ষ, শোষণ, প্রতিযোগিতা, ক্ষমতা, লাভ বা লোভ-নির্ভর সমাজের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে এবং সম্ভব হবে এক স্বপ্নের অহিংস সমাজের নির্মান।

সেক্ষেত্রে শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠক্রমেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু ততাকথিত অর্থেই নয়, এই পাঠক্রমে সত্যাবাদিতা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সহযোগিতা পিতা-মাতার কাজে সহায়াতা, সমাজ-সেবা এবং অবশ্যই স্ব-নির্ভরতার মত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষিত হলেই একজন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ সমাজে তার উপযুক্ত ভূমিকাকে প্রয়োগ করতে পারবে। পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের অধিকাংশ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিকের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। এর দ্বারা ছাত্ররা তাদের কাজকে কেবল যান্ত্রিক রূপে না দেখে এটির যথার্থ আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে তাদের সম্পূর্ণ প্রস্ফুটনকে ত্বরান্বিত করতে পারবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, গান্ধীজী প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিষয়ের ভিতটি দৃঢ় হলে, যে কোন ভাষায় জ্ঞান আহরণ সম্ভব।

মহাত্মার স্বপ্নের সমাজকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের কর্ত্তব্য সমস্ত মানুষের শিক্ষা পাবার সম-অধিকারকে সুনিশ্চিত করা। প্রয়োজন বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। সামগ্রিক উন্নতির পথে উত্তরণের জন্য এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার কর্মসূচী রূপনারায়ণের প্রতি আজ নজর ফেরানো আবশ্যিক। সেক্ষেত্রে কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করলেই চলবে না। প্রয়োজন যান্ত্রিক কুশলতা, শিল্পের আকার, পরিচালন ব্যবস্থা-এমনকি যোগ্যতার মত বিষয়গুলিকেও নতুন আলোতে দেখা।

শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর মডেলকে সার্বিকাভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে এক সত্য সমাজের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন, যে সমাজের মূল বাণী হবে সহযোগিতা। বর্তমান পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের জন্য আর্থিক সম্পন্নতা সুনিশ্চিফ করা বাস্তবে অসম্ভব। কারণ, প্রচলিত কাঠামোয় কতিপয় রাষ্ট্রের অধীনে রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ সমপদের ভোগের মালিকানা। উল্লেখ করা যেতে পারে, সমগ্র আমেরিকাবাসী যারা পৃথিবীর জনসংখ্যার সাত শতাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, তারা পৃথিবীর এক বিরাট পরিমাণ সম্পদকে ভোগ করার অধিকার দখলে রেখেছে। এমত পরিস্থিতিতে উপযুক্ত শিক্ষাই মীমাংসা হতে পারে। কারণ তখন উৎপাদন ও ভোগ্যসীমার মধ্যে সমীকরণ করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সম্ভব হবে বেতনহার ও দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখা। বহুমতের ভিত্তিতে নয়, সেদিন 'সত্য সমাজ' পরিচালিত হবে সহমতের ভিত্তিতে। সামাজিক সকল হিংসা উৎসকে উৎখাত করে শান্তি ও গণতন্ত্রের পথকে সুগম করতে সেদিন গান্ধীজীর দেখা শিক্ষাই এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

বস্তুত, মহাত্মা গান্ধী সেই নীরব বিপ্লবকেই শিক্ষার মাধ্যমে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন।